# বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং জিয়া

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ

উপমহাদেশের এ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আদর্শ বরাবর ছিল প্রেরণার উৎস। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনগণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। এজন্যে জনগণ সংগ্রাম করেছে। রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে লক্ষ্য। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চিরঞ্জীব করাই বাংলাদেশের জনগণের একান্ত কামনা।

যা আশা করা গিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে তাই হয়েছিল। নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্নেই জনগণ লাভ করে গণতান্ত্রিক সংবিধান। ১৯৭২ সালের সাময়িক সংবিধান আদেশে (Provisional Constitution order, 1972) বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রিপরিষদ হয় রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সে ধারা অব্যাহত রইলো। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূল সুর সংসদীয় গণতন্ত্র। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ও জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রিপরিষদ এই ছিল সংবিধানের মৌল বক্তব্য। মনে হয়েছিল এ জাতির প্রত্যাশা পূর্ণ হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এ ব্যবস্থা বেশীদিন টিকেনি। মাত্র ক'বছরের মধ্যে সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা এক পা দু'পা করে কর্তৃত্ববাদী এক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হলো।

১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হবার বছর খানেকের মধ্যে এটি সংশোধন করে জরুরী বিধানসমূহ সংযোজিত হলো। ১৯৭৪ সালে জরুরি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তার মূল্য শিথিল করা হলো। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন আইনের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রবর্তিত হলো রাষ্ট্রপতিক সরকারের নামে 'রাষ্ট্রপতিক কর্তৃত্ববাদী' (Presidental Leviathan). বহুদলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয় একদলীয় একত্ববাদ (One-Party monolits)। মৌলিক অধিকার এবং ন্যায়নীতির অভিভাবক বিচার বিভাগকে আনা হলো নির্বাহী বিভাগের পদতলে। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে অবাধ তথ্য প্রবাহের পরিবর্তে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মাত্র চারটি সংবাদপত্রের প্রচলনের বিধি গৃহীত হয়। যে নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল তাও অস্বীকার করে শেখ মুজিবুর রহমানকে পরবর্তী (পাঁচ) বছরের জন্যে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করা হলো এমনভাবে যে, তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়টির সমাপ্তি এভাবে ঘটে।

দীর্ঘদিনের গড়া সৌধ বিধ্বস্ত হতে পারে এক মুহূর্তে, কিন্তু পুনরায় তা গড়ে তোলা, কোটি কোটি জনগণের স্বপ্নজড়ানো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে আবারো প্রাণবন্ত করা যে কি কঠিন কাজ তা প্রতিপদে অনুভব করেছেন এ মাটির অন্যতম শ্রেষ্ঠতম সন্তান জিয়াউর রহমান। তিনি সফল হয়েছিলেন। যা অবশিষ্ট ছিল তা সম্পূর্ণ করেন তাঁরই সুযোগ্য সহধর্মিনী দেশনেত্রী খালেদা জিয়া, ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরে। ঐ বছরের ৬ আগস্টে জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত দ্বাদশ সংশোধন আইন ১৫ সেপ্টেম্বরে জনগণ কর্তৃক গণভোটে অনুমোদন লাভ করে।

এদিক থেকে বলা যায়, জিয়া হলেন রূপকথার তেমনি এক রাজপুত্র যার সোনার কাঠির মোহনীয় স্পর্শে অগণতান্ত্রিকতা এবং কর্তৃত্ববাদের সব কালো ছায়া অপসারিত হয়ে গণতান্ত্রিকতার উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ঝলমল করে ওঠে।

জিয়া শুধুমাত্র একটি নাম নয়, বাংলাদেশ রাজনীতির একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের নাম জিয়া। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রবেশের কথা নয়। জাতীয় ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে জাতীয় স্বার্থের টানেই তাঁকে এ পথ মাড়াতে হয়েছিল। একজন সৈনিকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান ছিলেন অবসর গ্রহণ করা। কিন্তু তা হয়নি। তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হয়েছে। তাঁকে হতে হয়েছে ডেপুটি চীফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর, চীফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। এ জাতি তাঁকে হারিয়েছে এমন এক সময়ে যখন তাঁরই প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। ঘাতকের নির্মম আঘাতে তাঁকে সরে যেতে হয়েছে অকালে। সরে যেতে হয়েছে তার আপনজনদের নিকট থেকে। তিনি কিন্তু বেঁচে রয়েছেন তাঁর কর্মের মাধ্যমে, সৌকর্মের সৌরভে, গণতন্ত্রের দিশারী রূপে। বাংলাদেশের মানুষের মনের মণিকোঠায় পরম গৌরবময় জাতীয় সম্পদরূপে।



ভাষণদানরত প্রেসিডেন্ট জিয়া

জিয়াউর রহমান যখন পঁচাত্তরের শেষ প্রান্তে ক্ষমতাসীন হলেন তখনকার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখবেন, যে গণতন্ত্রের শুভ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ তার জয়যাত্রা শুরু করেছিল সে গণতন্ত্র রাজনৈতিক সমাজ থেকে নির্বাসিত। একদলীয় বাকশালের তাণ্ডবে বহুদলীয় ব্যবস্থা মৃত। সামরিক অভ্যুত্থান-প্রতি অভ্যুত্থানের কষাঘাতে জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষের অর্থহীন বিতর্কে জাতীয় ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন, ডান, বাম ও কেন্দ্রের টানাপড়েনে গণতান্ত্রিক চেতনা নিঃশেষিত প্রায়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে একটি অসমাজতান্ত্রিক দল কর্তৃক দেশে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা হয় সাধারণ মানুষের জীবনকে তা করে তোলে দুর্বিষহ। 'তলাবিহীন ঝুড়ি' অভিধায় বাংলাদেশ বিশ্বময় হয় পরিচিত। দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে বিরাট সংখ্যক জনসমষ্টির প্রাণান্ত হয়। রাজনীতি হারায় তার গতি। চিন্তা এবং মত প্রকাশের সকল বাতায়ন হয় রুদ্ধ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ বন্ধুবিহীন, একঘরে। এমনি করুণ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন জিয়া। কোন প্ল্যান পরিকল্পনার মাধ্যমে নয়, নয় কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। নিছক রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্যে সৃষ্ট নেতৃত্বের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে।

জিয়ার ক্ষমতাসীন হবার বছর দুই পরের দৃশ্য দেখুন। তফাৎটুকু যে কারো চোখে পড়বে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যে জনগণের পবিত্র আমানত এবং তার প্রয়োগ যে জনকল্যাণে হওয়া উচিত, দলীয় স্বার্থে নয় তার দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে। বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। বহুদলীয় কাঠামোয় জনসমর্থন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দল কার্যরত রয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুস্থ মাধ্যম হিসেবে দলকে ব্যবহার করে নির্বাচন প্রতিষ্ঠানকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়। গণতন্ত্র যে আইনের শাসন এবং তার পূর্বশর্ত যে আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন তার প্রতিফলন দেখা যায় সমাজের সর্বত্র বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার দক্ষতা বৃদ্ধিতে। সামরিক বাহিনীর পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুনভাবে প্রশিক্ষণ দান এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা তথা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সুরক্ষিত করার নতুন আদর্শে প্রতিরক্ষা বাহিনী সুবিন্যস্ত হয়েছে। সংবাদপত্রের চোখ-মুখ-কান খোলা রয়েছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ জায়গা করে নিয়েছে। আজকের বাজার অর্থনীতির যে বিশ্বময় অবাধ গতি তার সূচনা বাংলাদেশে তখন থেকেই। তলাবিহীন ঝুড়ির শত ছিদ্র ক্রমে ক্রমে বন্ধ হচ্ছে। সংকীর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আড়ালে যে কদর্য ভেদবুদ্ধি সঞ্চিত হচ্ছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উদার এবং বৃহৎ পরিমণ্ডলে জাতীয় ঐক্য ধীরে ধীরে প্রাণবন্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ লাভ করেছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক বন্ধু এবং সহযোগী (জাতিসংঘে বাংলাদেশ সম্মানের আসনে আসীন হয়েছে। হাজার বছরের জমাট বাঁধা সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের মধ্যেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের নেতৃত্বে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। যেভাবেই দেখুন না কেন, এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপের মূল ছিল জিয়ার নেতৃত্বের স্পর্শমণি। তিনি যা কিছু স্পর্শ করেছেন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে তাই সোনা হয়ে উঠেছে।

আগেই বলেছি, তিনি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেননি। যখন এবং যে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছে। জাতি নেতৃত্বে, শূন্যতায় ছটফট করেছে তখনই এবং সেক্ষেত্রে জিয়া এগিয়ে এসেছেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জিয়ার তো স্বাধীনতার 'ঘোষণা' দেবার কথা নয়, তথাপি তাঁকেই সে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সাথে দফায় দফায় আলোচনা করে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যখন ব্যর্থ হন, বিশেষ করে পূর্ববাংলার অবিসংবাদিত নেতা। পরম পরাক্রমশালী শেখ মুজিব যখন ২৫ মার্চের মধ্যরাত্রিতে পাক সেনাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তার বিশ্বস্ত সহযোগীদের আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেন জনতার গণতান্ত্রিক চেতনা সামনে রেখে জিয়াকেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হয়। যারা বলেন, আত্মসমর্পণের পূর্বে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন অথবা চট্টগ্রামে হান্নান সাহেবকে মেসেজ পাঠিয়েছেন তা যে জল্পনা-কল্পনা তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। ২৫ মার্চের রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত পূর্ববাংলার সকল সংবাদ মাধ্যম ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ধানমণ্ডির ৩২ নং বাড়ীর চারপাশে দেশ-বিদেশের অসংখ্য সংবাদ সংগ্রাহক অপেক্ষা করছিলেন। পুলিশ, বিডিআর এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা একটা সংবাদের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন। অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর দলের ও অন্যান্য দলের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী। ছাত্রছাত্রীরাও কারো কাছে কোন কথা না বলে চট্টগ্রামের হান্নান সাহেবকে তিনি খুঁজে পেলেন। স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সে রাত্রিতে ঢাকার অবস্থা ভিন্ন রকম হতো। তা তিনি দেননি। তিনি যদি স্বাধীনতার ঘোষণাই দিতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, কে হবেন বাংলাদেশের কর্ণধার, কে হবেন তার প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি, যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে কে থাকবেন কোথা থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে এবং কোন কোন ফ্রন্টে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের এক ভাষণে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি শুনেছেন। মেজর জিয়া ২৬ মার্চ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে সামরিক শৃঙ্খলার সব কিছু ঝেড়ে মুছে এগিয়ে এলেন স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে। শুধু ঘোষণাই নয় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ তিনিই নিয়েছেন।

১৯৭৫ সালের ৭ মার্চে আবার যখন বাংলাদেশের রক্তেরঞ্জিত স্বাধীন অনিশ্চয়তার ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হবার উপক্রম হয়। ছাত্র-জনতা-সিপাহী বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গের মাথায় হাত রেখে এগিয়ে এলেন জিয়া এবং বাংলাদেশের জাহাজের প্রধান নাবিক হিসেবে হাল ধরলেন শক্ত হাতে। সামরিক শাসক হিসেবে যারা তাঁকে চিহ্নিত করতে চান তাদের জন্যে ঐটাই যথেষ্ট যে, তিনি সামরিক আইন জারি করেননি। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হননি। নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্যে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করেননি। তিনি বরং সামরিক শাসন থেকে এক পা দু'পা করে ধীরে ধীরে সরে এসে বাংলাদেশকে সিভিল সোসাইটির উপযোগী করে তোলেন। যেমনটি ফ্রান্সে জেনারেল দ্যাগল সমাজকে তৈরি করেন সিভিল সোসাইটির জন্যে।

জিয়ার নিকট গণতন্ত্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ছিল না গণতন্ত্রকে তিনি দেখেছেন এক জীবন ব্যবস্থারূপে তাই জীবনকে সুন্দর করার জন্যে যা যা প্রয়োজন তিনি সে দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। শিল্পকলা থেকে শিশু একাডেমী। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিএনসিসি, রাজনৈতিক দল থেকে আঞ্চলিক সংস্থা, কর্তৃত্বের অগ্রগতি থেকে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি। ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে সংস্কৃতি চর্চা। প্রথম সরকার থেকে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের স্বাধীনতা সকল ক্ষেত্রেই ছিল জিয়ার অবাধ বিচরণ। আজকের বাংলাদেশের ঘর দেয়ালের যেদিকে তাকাই না কেন সব দিকেই রয়েছে জিয়ার বৃহৎ প্রতিকৃতি জনগণের মনের মণিকোঠায়। অনেক কাজ তিনি সম্পাদন করতে পারেননি বটে কিন্তু সূচনালগ্নেও তা গৌরবজনক। বাংলাদেশে তাঁকে ভুলবে কার সাধ্য?



নেপালের রাজা ও রাণীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়া ও বেগম জিয়া

# এই কাননের ফুল

আনোয়ার জাহিদ

টমাস কারলাইল লিখেছিলেন, "A hero appears in the world according to the need of his time"(তার সমকালের প্রয়োজনেই পৃথিবীতে এক একজন হিরোর আবির্ভাব হয়)।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তেমনি একজন হিরো, একজন মহানায়ক। বাংলাদেশ, বাংলাদেশী জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থান ও নির্মাণে তিনি বহু এবং বহুধা বিস্তৃত কালজয়ী অবদান রেখে গেছেন। একটি নিবন্ধে তার সবগুলোর বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আমি এই নিবন্ধের পরিসরে মাত্র পাঁচটি অবদানের উল্লেখ করতে চাই। এর যে কোন একটির জন্য একজন মানুষ ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাকতে পারেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্য রাতের এই জনপদ এবং জনপদের মানুষ দিকনির্দেশনাহীন এক ভয়াবহ বিপন্ন অবস্থায় পড়েছিল। রাজনৈতিকভাবে পরাজিত পরিস্থিতিতে সামরিক বিজয় অর্জনের পথ সেদিন পাকিস্তানের শাসক মহল বেছে নিয়েছিল। এমন একটি পরিস্থিতি মোকাবিলার কোন চিন্তা সেদিন আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছিল না। ২৫ মার্চের পর তা নিষ্ঠুর সত্য হয়ে দেশবাসীকে হতচকিত করেছিল। ২৫ মার্চ পর্যন্ত যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কার্যকর ছিল, মধ্যরাতের পর তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত হয়ে পড়েছিল। চরম অসহায়ত্ববোধ থেকেই জাতি সেদিন কারো কাছ থেকে অভয় বাণী শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। সেই বিপন্ন দিনে ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক অচেনা মেজর। তাঁর নাম জিয়াউর রহমান। 'আমি মেজর জিয়া বলছি'--এই চারটি শব্দ সেদিন সমগ্র জাতিকে আশ্বস্ত করেছিল। সমগ্র জাতিকে সুস্পষ্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রতি নাগরিকের ধমনিতে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করেছিল। নেতৃত্বহীন অনিশ্চয়তার মাঝে আশা এবং আস্থার নিশ্চিত স্থান নির্মাণ করেছিল। '৭১ সালের ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার কথাগুলো ঘোষিত না হলে আমাদের ইতিহাস কেমন হতো তা ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে।

জিয়াউর রহমান সেদিন কেবল আমাদের স্বাধীন অস্তিত্বের ঘোষণাই দেননি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের ডাকই দেননি। নিশ্চিন্ত অবস্থানের নিরাপদ আশ্রয়ে নয়, সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাকি জীবনে আর কিছু না করলেও তাঁর এই অবদানের জন্যই ইতিহাস তাঁকে অমর করে রাখতো।

১৬ ডিসেম্বর-উত্তর বাংলাদেশে এই চেতনা বা এই আকাঙ্ক্ষাগুলির নির্মম মৃত্যু হয়েছিল। সমগ্র জনগণ, মুক্তিযোদ্ধা এবং সকল রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত ইচ্ছা প্রতিফলিত করে এমন একটি সরকার সেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমগ্র জাতির স্বাধীনতাযুদ্ধকে দলীয়করণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের হাতে তাই স্বাভাবিক কারণেই আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষিত হয়নি। ২৫ বছরের চুক্তির মাধ্যমে তা ভিন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলা হয়েছিল। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা কবরস্থ করা হয়েছিল। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের নামে এক লুটেরা অর্থনীতির জন্ম দেয়া হয়। যার ফলে দৈনিক ইত্তেফাকের ভাষায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি 'ফোকলা' হয়ে পড়ে। '৭৪ সালের মনন্তর সেই অর্থনীতিরই পরিণাম।

আরেকবার দেশ, জাতি এবং জনগণ বিড়ম্বিত বিপন্ন অবস্থার মুখোমুখি হয়। সমগ্র জাতি পরিত্রাণের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। অপহৃত স্বাধীনতা, নিহত গণতন্ত্র এবং লুণ্ঠিত অর্থনীতিতে বিপর্যস্ত জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে '৭৫ সালের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে। সে পরিবর্তনকে নস্যাৎ করার জন্য ৩রা নভেম্বরের প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সিপাহী জনতার সম্মিলিত অভ্যুত্থানের পুরোভাগেই আরেকবার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আরেকজন হিরোর আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। সেই 'হিরো' হিসেবেই মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আরেকবার আবির্ভূত হন।

'৭৫ সালের ৭ নভেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমানই অতীতের সকল লীগেসি মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তার দ্বিতীয় মহৎ অবদান।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা আকাঙ্ক্ষা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বন্ধ দুয়ার খুলে দেন। সকল মৌলিক মানবাধিকার আমাদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তাঁরই। জিয়াউর রহমানই সংবাদপত্রকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। ধর্মনিরপেক্ষতার কপট আবরণে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক দল গড়ার সর্বজনীন অধিকার ১৯৭২ সালের সংবিধানে অস্বীকৃত হয়েছিল। এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানও তাঁর হাতেই ঘটেছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, যে ভারতের কাছ থেকে ১৬ ডিসেম্বর-উত্তর সরকার 'ধর্মনিরপেক্ষতার' দীক্ষা নিয়েছিলেন সেই ভারতের সংবিধানে কিন্তু রাজনৈতিক দল গড়ার উপর '৭২ সালে আরোপিত বিধিনিষেধ নেই। এটি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আরেকটি ঐতিহাসিক অবদান।

বাংলাদেশের মতো একটি দেশ তার স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে কেবলমাত্র একটি জাতি রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকতে পারে। আর একটি জাতি রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বোধ একান্তভাবেই প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই তত্ত্বগত বিষয়টি সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। তিনি সকল বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি জাতির ইতিহাস, জনগণের ধর্মবিশ্বাস, দৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবনাচারের সমন্বিত অভিব্যক্তিই সেই জাতির জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এই সঠিক উপলব্ধি থেকেই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে '৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিবর্তন আনেন। সংবিধানের প্রারম্ভে তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এই কালামটি সন্নিবেসিত করেন। সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় প্যারা পঞ্চম সংশোধনীতে নিম্নরূপে পুনর্লিখিত হয়।

'আমরা অঙ্গিকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সামজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে '৭২ সালে সংবিধানের এই প্যারায় বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস' এই কথা এবং সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যামূলক শব্দগুলো সংস্থাপন করেন।

এই পরিবর্তনের আলোকে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সংক্রান্ত ৮ (১) ধারা পুনঃলিখিত এবং ৮ (১ক) ধারা সন্নিবেশিত।

আমাদের জাতিসত্তার এই ভিত্তিকে সামনে রেখেই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জনগণের জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হিসেবে সজ্ঞায়িত করেছিলেন।

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল 'বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক (Friend, Philosopher and Guide) হিসেবে পরিচিত ভবানী সেনগুপ্ত কিছুদিন আগে তার এক নিবন্ধে লিখেছেন, বাংলাদেশ একটি জাতি রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকতে পারে এবং বাংলাদেশের জাতিসত্তার পরিচয় হচ্ছে জাতীয়তাবাদ।

ভবানী সেনগুপ্ত এখন যা বলছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালেই তা উপলব্ধি এবং নির্ধারণ করেছিলো। এখানেই তাঁর মহত্ব এবং দূরদর্শিতা। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তাই কেবল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনই ঘটেনি একটি আদর্শিক পরিবর্তনও ঘটেছিল।

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি সম্মেলনে পঠিত তাঁর নিবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ আফতাব আহমদ বলেছেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ হচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় আধিপত্যবাদের তত্ত্বগত হাতিয়ার। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আমাদের সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আরেকটি মহান অবদান হচ্ছে জাতীয় সমঝোতা বা সমন্বয়ের রাজনীতি (Politics of National reconciliation)। তিনি এ কথাটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার জন্য জাতীয় সমন্বয় অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর প্রথম সাড়ে তিন বছর যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি ছিল না। জাতীয় সমন্বয়ের পরিবর্তে তারা জাতিকে আরও বিভক্ত করেছিলেন।

জাতীয় সমন্বয়ের এই উপলব্ধি জিয়াউর রহমানের মাঝে ১৯৭১ সালেই প্রকাশ পেয়েছিল। কালুরঘাট বেতার থেকে তিনি প্রথম যে ঘোষণা পাঠ করেছিলেন তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের উল্লেখ ছিল না। মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণাটি সরকার প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থমালায় স্থান পায়নি। তার মূল কপিটিও বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে বলে শোনা যায়। ঐ গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মেজর জিয়ার দ্বিতীয় ঘোষণাটি আছে। ঘোষণাটি উদ্ধৃত করছি ঃ

"Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh liberation Army, hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

"I also declare, we have already formed a sovereign, legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges function as per law and the constitution. The democratic Government is Committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all Government to mobilise public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

"The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world".

(২৭ মার্চ, ১৯৭১)

এখানে বলা বাহুল্য যে, মেজর জিয়ার এ দু'টি ঘোষণার মাধ্যমেই বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রথম শুনেছিল এবং জেনেছিল। এই ঘোষণাটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় যেভাবে ছাপা হয়েছিল হুবহু সেভাবেই 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।

# Unforgettable Zia: We Remember You

Today is the 16th anniversary of death of Shaheed President Ziaur Rahman. He is the founder of modern and prosperous Bangladesh when country was deep into the shock of poverty and famine. He has saved the nation with his economic endeavour, showed the way to the People of Bangladesh and placed us in an honourable position. His economic achievements from 1976-81 compared to 1974-75 are indicated in the above figures. We remember him with deep sense of gratitude. We the 120 million people of Bangladesh pray to Allah for the salvation of his departed soul. Amin. Bangladesh Zindabad

























# আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি জিয়াউর রহমান

প্রফেসর জসীম উদ্দিন আহমদ

স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের প্রত্যাশা ছিলো 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার'। এই প্রত্যাশা পূরণে তিনি যখন অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন, তখনই আধিপত্যবাদের ষড়যন্ত্র জনগণের প্রিয় নেতাকে ছিনিয়ে নেয় জনতার কাছ থেকে। ১৯৮১ সালে শহীদ হন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

স্বাধীনতার পর যারা ক্ষমতায় ছিলো তাদেরই উত্তরসুরি বর্তমান সরকার। সরকার প্রধান থেকে সবাই ঐক্যসুরে বলছে, গত একুশ বছর অর্থাৎ ১৯৭৫-এর আগস্টের পর থেকে ১৯৯৬-এর জুন পর্যন্ত এদেশে কিছুই হয়নি-দেশ অনেক পিছিয়ে গেছে। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির (Information technology) যুগ। এখন কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহার করে সব তথ্যই দ্রুত পাওয়া যায়-যাচাই করা যায়। এ ছাড়া লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তথ্যগুলো সংগ্রহ করা যায়-তবে এতে সময় একটু বেশী ব্যয় হয়।

অবতারণা। প্রবন্ধের তথ্যসমূহ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ (Statistical Year Book) ১৯৭৯, ১৯৮৩-৮৪ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন, ১৯৯৪ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

অর্থনীতি ঃ ১৯৭৩-৭৪ সালে জিডিপি (GDP at current factor cost) ৬৭,৭১১ মিলিয়ন টাকা। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে গতিশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে জিডিপি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮০-৮১ অর্থবর্ষের শেষে ২,২৫,৬১৯ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয় অর্থাৎ ৩.৩৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। জনপ্রতি জাতীয় আয় (NNP) ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে ৮৮৯ টাকা ছিলো যা ২.৬৩ গুণ বেড়ে ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে এসে ২,৩৩৭ টাকায় উন্নীত হয়।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রায় লুপ্ত মর্যাদার একটি জাতিকে বিশ্ব দরবারে আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আমলে বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। দেশের অগণিত মানুষের জীবনের দুঃস্বপ্ন কেটে গিয়ে এক সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছিলো-'তলা-বিহীন ঝুড়ি' বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে বেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলো। এ জন্যই জিয়াকে আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি বলা হয়।